আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে সংগঠিত করেছে, সেই ব্যাখ্যা নিহিত আছে এই তত্ত্বটির মধ্যে।

২.২ রাজনৈতিক বাস্তববাদ (Political Realism) ঃ

রাজনৈতিক বাস্তববাদের উৎস সন্ধানে ঃ মাইকেল ডয়েল (Michael Doyle) বা টেরি নারডিন (Terry Nardin) ও ডেভিড মেপল (David Mapel) রাজনৈতিক বাস্তববাদের আদিতম সন্ধান পান থুসিডাইডিসের (Thucydides) লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ The Peloponnesian War-এ। এই যুদ্ধটি হয়েছিল মূলত এথেনস ও স্পার্টার মধ্যে ৪৩১ বি. সি ও ৪০৪ বি. সি.-র মধ্যে মাঝখানে সাতবছরের একটি তথাকথিত 'শান্তি' বজায় ছিল। থুসিডাইডিস ছিলেন একজন এথেনীয় সৈন্যাধ্যক্ষ — এবং এই গ্রন্থটি মূলত একজন অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষকের দিনলিপি। এই যুদ্ধের কারণ খুঁজতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন মূলত এথেন্সের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও স্পার্টার নিরাপত্তা বোধের অভাব কিভাবে সারা গ্রীস জুড়ে এক সর্বগ্রাসী যুদ্ধের সূচনা করেছিল। এই গ্রন্থটির অন্যতম প্রধান অংশ হচ্ছে 'The Melian Dialogue'। এথেন্স যখন মেলস্ (Melos) আক্রমণ করে মেলস্কে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের অনুরোধ জানায়, তখন মেলস্ের কাউন্সিল সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বলে "...We invite you to allow us to be friends of yours and enemies to neither side, to make a treaty which shall be agreeable to both you and us, and so to leave out country"। এ যেন এক চিরায়ত আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টা— "আমরা আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যেন আপনারা আমাদেরকে আপনাদের বন্ধু হতে এবং কেউই কারো

প্রতি শত্রু না হতে সম্মত হোন— এমন এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হোক যা উভয় পক্ষের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে এবং আমাদের দেশ ছেড়ে আপনারা চলে যাবেন।" স্বাভাবিক ভাবেই এথেন্স মেলস্‌কে ধ্বংস করে ও নিজস্ব প্রভূত্ব স্থাপন করে। এথেন্সের নীতিই ছিল "the standard of justice depends on the equality of power to compel and that in fact the strong do what they have the power to do and the weak accept what they are to accept." এও এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের নিজস্ব প্রভুত্ব স্থাপনের পদ্ধতি— ন্যায়বিচারের মানদন্ড নির্ভর করে অপরকে বাধ্য করার সমক্ষমতার ওপর যাতে শক্তিশালি রাষ্ট্র তাই করবে যা সে ক্ষমতাবলে করতে পারে, আর দুর্বল রাষ্ট্রকে সেটাই মেনে নিতে হবে যা তাকে মানতেই হবে। অর্থাৎ ক্ষমতাবানের ক্ষমতার সামনে দুর্বলের আত্মমর্যাদা বিনাশের বীজ বপন করে; এবং সম্ভবতঃ, অসাম্যের দুনিয়ায় ক্ষমতাই আন্তঃরাষ্ট্র নীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে।

এই ক্ষমতার তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় নিকোলো মেকিয়াভেলির (১৪৬৯ — ১৫১৩) লেখায়। তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য প্রিন্স' (১৫৩২)-এ তিনি লেখেন, ".....a prince, and especially a new prince, cannot observe all these things which are considered good in men, being often obliged, in order to maintain the state, to act against faith, against charity, against humanity, and against religion." মেকিয়াভেলি মনে করতেন, একজন রাজা বিশেষতঃ তিনি যদি নূতন রাজপদে অভিষিক্ত হন, কখনই সে সমস্ত আদর্শ মেনে চলতে পারেন না যেগুলো সাধারণ মানুষ ভাল বলে মনে করে। যেহেতু তাঁর প্রধান কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রকে রক্ষা করা, সেহেতু তিনি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, বদান্যতার বিরুদ্ধে, মানবতার বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রপরিচালক রাষ্ট্রের স্বার্থে মানবিক রীতিনীতির উর্ধ্বে উঠতে পারেন এবং প্রয়োজনে অনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। রাষ্ট্রীয় স্বার্থরক্ষাই রাজার প্রধান কাজ এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনে রাজা ব্যক্তিজীবনে স্বীকৃত নীতিগুলিকে অস্বীকার করতে পারেন। মেকিয়াভেলি তার অন্যগ্রন্থ Discourses on the First Ten Books of Titus Livy (১৫১৩) গ্রন্থেও বলেছেন, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা যখন বিপন্ন হবে, তখন রাষ্ট্রনায়ক মর্যাদা, মানবিকতা বা ন্যায়বিচার ইত্যাদি শব্দগুলি দূরে সরিয়ে রেখে, রাজ্য রক্ষায় যা প্রয়োজনীয় মনে করবেন, তাই করবেন।

তবে রাজনৈতিক বাস্তববাদের সমর্থন সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশী খোঁজা হয়েছে টমাস হবসের (১৫৮৮—১৬৭৯) লেখা লেভায়াথান (Leviathan) (১৬৫১) নামক গ্রন্থে। হবসের বক্তব্য অনুসরণ করে প্রকৃতির রাজ্যে অবাধ ও চিরস্থায়ী নৈরাজ্য এবং বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর সংগ্রামের ধারণাগুলিই নিয়ে আসা হয়েছে আন্তর্জাতিক

সম্পর্কের ক্ষেত্রে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যেহেতু নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা এবং যেহেতু নিজ নিজ নাগরিকের নিরাপত্তার জন্য দায়বদ্ধ, এবং যেহেতু কোন রাষ্ট্রই বলপ্রয়োগের অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেনি, সেহেতু রাষ্ট্র কখনই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অপর রাষ্ট্রের স্বার্থ দেখবে না। চার্লস বেৎজের (Charles Beitz) ভাষায়, "The necessity (or "duty") to follow the national interest is dictated by a rational appreciation of the fact that other states will do the same, using force, when necessary, in a manner unrestrained by a consideration of the interests of other actor or of the international community"। এর অর্থ হচ্ছে ঃ জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনীয়তা বা এর প্রতি কর্তব্য করার পেছনে মূল নির্দেশিকাই হচ্ছে এক যুক্তিবাদী উপলব্ধি যে অপর রাষ্ট্রও একই কাজ করবে— দরকার হলে বলপ্রয়োগ করবে— যেখানে সে অন্য রাষ্ট্রের বা আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর স্বার্থ একেবারেই ধর্তব্যের মধ্যে আনবে না। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ রক্ষাই যে কোন রাষ্ট্রের প্রধান কাজ।

কোন কোন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ, যেমন, কেনেথ ওয়ালজ্ (Kenneth Waltz), তার গ্রন্থ 'Man, the State and War' (১৯৪৯)-এ রুশোকে (Rousseau) (১৭১২ — ১৭৭৮) বাস্তববাদী বলে অভিহিত করেছেন। একথা সত্যি রুশো 'The State of War' প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে বর্ণনা করতে গিয়ে রাষ্ট্রের যে ভূমিকার কথা বলেছেন, তা বহুলাংশেই সাম্প্রতিক কালের বাস্তববাদীদের বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়। যেমন, তিনি একজায়গায় বলছেন ".....it (the state) can always grow bigger; it feels weak so long as there are others stronger than itself. Its safety and preservation demand that it makes itself stronger than its neighbours. It cannot increase, foster or exercise its strength except at their expense, and even if has no need to seek for provisions beyond its borders, it searches ceaselessly for new members to give itself a more unshakable position."। রুশোর মতে, রাষ্ট্র সবসময় বড় হতে পারে— নিজের চেয়ে শক্তিশালী প্রতিবেশী থাকলেই, সে নিজেকে দুর্বল অনুভব করে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণই একে এর প্রতিবেশীর চাইতে শক্তিশালী হওয়ার প্রচেষ্টার জন্য দায়ী। রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধির বা ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রবণতা সবই হয় অন্যরাষ্ট্রের ক্ষতির বিনিময়ে— কোন রাষ্ট্রের যদি নিজ নিজস্ব সীমানার বাইরে কোন প্রয়োজন নাও থাকে, তাহলেও সে অবস্থানকে অনমনীয় রাখার জন্য অন্তহীনভাবে নূতন রাষ্ট্রের অনুসন্ধান করতেই থাকে। অর্থাৎ, ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, নিরাপত্তাহীনতা ও তার দূরীকরনে প্রয়োজনে শক্তি সাম্যের

প্রতিষ্ঠা সবই কিন্তু সমসাময়িক রাজনৈতিক বাস্তববাদের উপকরণ হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু, একথা মনে রাখা দরকার, রুশোর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে হতাশা কিন্তু এসেছে যে সূত্র থেকে, তা বাস্তববাদীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ক্রিস ব্রাউন (Chris Brown) ও অন্যদের ভাষায়, "Whereas realists would normally claim that "natural" way to live is in conflict, that the international system magnifies this, and that thus conflict is an inevitable and inescapable feature of international politics, for Rousseau it is precisely because we have moved away from nature into civilization that this situation has arisen." অর্থাৎ বাস্তববাদীদের মত অনুযায়ী 'প্রাকৃতিক' অবস্থায় মানুষ নিয়ন্ত্রণ এক সংঘাতের পরিবেশেই বাস করত—আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এই অবস্থাকে আরও বড় করে তুলেছে, পরিণতিতে সংঘাত আন্তর্জাতিক রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী ও অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল। রুশো কিন্তু মনে করতেন প্রকৃতি থেকে সভ্যতায় প্রবেশই বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

এখানে উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে বাস্তববাদের অন্যতম ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে কৌটিল্যের নাম উল্লিখিত না হলেও অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, কৌটিল্য মেকিয়াভেলির চেয়েও অনেক বেশী সূক্ষ্ম চিন্তাবিদ ছিলেন। বস্তুতপক্ষে, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটিতে একটি বিশাল অংশ (নবম ও দশম ভাগ) পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কৌটিল্যের মতে, বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে রাজার মূল লক্ষ্যই হবে রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি করা, সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করা এবং শত্রুকে সংহার করা। এর পাশাপাশি অবশ্য কৌটিল্যের উপদেশ হচ্ছে, যুদ্ধের চাইতে শান্তিই অনেকবেশী কাম্য এবং জয়ে অথবা পরাজয়ে রাজা সর্বদাই যথার্থ আচরণ করবে। আবার, দুর্বল রাজার প্রতি তার উপদেশ "One should neither submit spinelessly nor sacrifice oneself in foolhardy valour. It is better to adopt such policies as would enable one to survive and live to fight another day"। এই মত অনুযায়ী মেরুদন্ডহীনের মতন আত্মসমর্পণ করা বা বোকার মত সাহস দেখিয়ে আত্মত্যাগ করা কখনই উচিত নয়। এমন নীতি অনুসরণ করা উচিত যাতে একজন বেঁচে থাকবে এবং পরদিনের লড়াইতে সক্ষম হবে। সম্ভবত কৌটিল্যের সবচেয়ে বড় অবদান হল উদ্দেশ্যকে খুব সহজ অথচ গভীরভাবে ব্যাখ্যা করা। তার মতে, ক্ষমতার মূল উদ্দেশ্যই হোল 'নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করা। আদর্শ নীতির মানদন্ডই হোল যেন তেন প্রকারেন নিজের মঙ্গলসাধন বা স্বার্থসিদ্ধি — আর তা না হলেই, সেই নীতি হবে অগ্রহণযোগ্য। অর্থশাস্ত্রের অনুবাদকের ভাষায় : "....any human action which increases one's welfare is a good policy; otherwise, it is a bad policy." অর্থাৎ যে কাজই ব্যক্তির উন্নয়ন ঘটায় তাই হল ভাল নীতি— আর তা না হলেই খারাপ নীতি।

২.৩ সাবেকি বাস্তববাদ ঃ কার ও মর্গানথাউ

সাম্প্রতিককালে সাবেকি বাস্তববাদের (Classical realism) উদ্‌গাতা হিসেবে ই. এইচ্. কারের (E. H. Carr) নাম উল্লেখ করা হয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Twenty Years Crisis' (১৯৩৯) এই তত্ত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। তবে গ্রন্থটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বের আলোচনার চেয়েও সমসাময়িক আদর্শবাদের সমালোচনা হিসেবেই পরিগণিত হয়ে থাকে। কার-এর মতে আদর্শবাদীগণ চিন্তার চেয়ে স্বপ্নের দ্বারা, পর্যবেক্ষণের চেয়ে সামান্যীকরণের দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁর মতে রাজনৈতিক বাস্তববাদ প্রতিষ্ঠিত হবে সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা এবং বাস্তব ঘটনাকে দেখবে তাঁর কার্যকারণ এবং এর ফলশ্রুতি হিসেবে। আদর্শবাদীগণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার ভূমিকা এবং সংঘাতের মূল কারণ হিসেবে ক্ষমতাকে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই চিন্তাবিদগণ যে আদর্শের কথা বলেন, যেমন যৌথ নিরাপত্তার মাধ্যমে যুদ্ধের অবসান, কূটনীতির পরিবর্তে জনগণের সম্মতির মাধ্যমে বিদেশনীতি পরিচালন ইত্যাদি সমস্তই বিজয়ী গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি মনে করেন অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান গোষ্ঠী নিজস্ব নিরাপত্তা ও প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য শাসক গোষ্ঠী যেমন শান্তি বজায় রাখার কথা বলেন, ঠিক তেমনই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান রাষ্ট্রগুলি নিজস্ব ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য শান্তির কথা বলেন। কার মনে করেন, যে কোন রাষ্ট্রেরই উচিত তার জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করা এবং শক্তি সাম্যের মাধ্যমে ক্ষমতাবান রাষ্ট্রের শক্তিকে প্রতিরোধ করা। যেহেতু যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত কয়েকটি ক্ষমতাবান রাষ্ট্রের প্রভুত্বের স্বীকার হয়, সেহেতু শক্তি সাম্যের নীতি তুলনামূলক ভাবে শান্তির পথে বেশী কার্যকর। যৌথ নিরাপত্তার ওপরে অধিক গুরুত্ব জাতিসঙ্ঘের পতনের অন্যতম কারণ বলে কার মনে করতেন।

কিন্তু সাবেকি বাস্তববাদের মূল প্রবক্তা হিসেবে বর্তমানে সকলেই হান্‌স মরগেনথাউয়ের (Hans J. Morgenthau) নাম করেন। তার ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত 'Politics among Nations : The Struggle for Power and Peace' গ্রন্থটি সাবেকি বাস্তববাদের একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে পরিগণিত হয়। তিনি মনে করেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিজ্ঞান তৈরী হবে বাস্তব জীবনের ঘটনাবলীর পরম্পরার মাধ্যমে এবং সদর্থক নিয়মবিজ্ঞানের (positivist methodology) যথার্থ প্রয়োগের দ্বারা। তাঁর মতে, তত্ত্ব হবে বাস্তবভিত্তিক, স্বাধীন, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। মরগেনথাউয়ের মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি 'বাস্তব' আছে যা 'জানা যায়' ('knowable reality) এবং বিদেশনীতির ক্ষেত্রে একটি 'যুক্তিপূর্ণ সারবত্তা' আছে যা তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অপূর্ণতা আছে, তা নিহিত আছে মানবচরিত্রের অপূর্ণতার মধ্যে।

আর স্বার্থের সংঘাত যেখানে একমাত্র চালিকা শক্তি, সেখানে নৈতিকতারও কোন জায়গা নেই।

মর্গেনথাউ রাজনৈতিক বাস্তববাদের ছটি মূলসূত্রের উল্লেখ করেন ঃ প্রথমতঃ, মানব চরিত্রে গভীরভাবে প্রোথিত কতকগুলি বস্তুভিত্তিক আইন (objective laws) দ্বারা রাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয়। এগুলি সময়ের অভিঘাতে বা মানুষের পছন্দ-অপছন্দ দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে কোন যুক্তিগ্রাহ্য তত্ত্বকেই হতে হবে এই বস্তুগত আইনের প্রতিফলন, যার ফলশ্রুতি হিসেবে ঘটনা (facts) এবং সত্যতা (truth) ও মতামতের মধ্যে পার্থক্য করা যায় এবং নিশ্চিত ভাবে যুক্তিগ্রাহ্য রাজনৈতিক ব্যবহার সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল সূত্র হচ্ছে স্বার্থই ক্ষমতা ("The key to understanding international politics is the concept of interest defined in terms of power")। সেটা যখন আমরা মেনে নেই, তখন রাষ্ট্রনীতি একদিকে যেমন স্বীকৃত হয় একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে, অন্যদিকে রাষ্ট্র নায়কদের উদ্দেশ্য ও আদর্শগত ইচ্ছা অনিচ্ছা দ্বারা পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত হয় এই বিভ্রান্তির থেকেও মুক্ত হওয়া যায়। মর্গেনথাউয়ের ভাষায় "it imposes intellectual discipline upon the observer, infuses rational order into the subject matter of politics and thus makes the theoretical understanding of politics possible."। আমরা বলতে পারি, এর ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পর্যবেক্ষকের ওপর বৌদ্ধিক নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়, রাজনীতির বিষয়বস্তুতে যুক্তিভিত্তিক শৃঙ্খলা আসে এবং রাজনীতির তাত্ত্বিক বোঝাপড়া সম্ভব হয়।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও গঠন সবসময়েই স্থান-কাল ও পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু জাতীয় স্বার্থ সমসবয়েই অপরিবর্তিত থাকে। রাষ্ট্র কি ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে তা অনেকটাই নির্ভর করবে সেই রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক পরিমণ্ডলের ওপর। মর্গেনথাউয়ের মতে, জাতীয় স্বার্থ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক চিরন্তন বলে মনে করার কোন কারণ নেই, কারণ রাষ্ট্র একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের সৃষ্টি এবং স্বাভাবিক ভাবেই ঐতিহাসিক নিয়মেই কোন সময় অন্তর্হিতও হয়ে যেতে পারে। চতুর্থতঃ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন চিরায়ত নৈতিক নীতি থাকতে পারে না। রাষ্ট্রের কাজের নৈতিক তাৎপর্য থাকতেই পারে, কিন্তু রাষ্ট্র কোন নৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়। রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী ও তার সার্থকতা নির্ভর করবে সেই কার্যসূচীর রাজনৈতিক ফলশ্রুতির ওপর। বিভিন্ন রাজনৈতিক বিকল্পের কি পরিণতি হতে পারে এবং কোন বিকল্প গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থের চূড়ান্ত পরিপূরণ হতে পারে তার সুদক্ষ আলোচনা ও বাস্তবায়নই রাজনৈতিক বাস্তববাদের মূল নিয়ন্ত্রক। পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্র যেহেতু কোন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত হয় না,

সেহেতু পররাষ্ট্রীয় বিষয়ে রাষ্ট্র যখন কোন নীতি ও আদর্শ ঘোষণা করে তখন তার পিছনে নিহিত থাকে, সেই রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবার একটি প্রচেষ্টা। সর্বশেষতঃ, আন্তর্জাতিক রাজনীতি অন্যান্য যে কোন বিষয় থেকে স্বতন্ত্র। আন্তর্জাতিক বিষয়ের মূল প্রশ্নই হল ঃ ক্ষমতা কিভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ককে নির্ধারণ করে? অথবা, একটি নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণের ফলে সেই রাষ্ট্রের ক্ষমতা কতখানি বাড়ে এবং জাতীয় স্বার্থসিদ্ধি হয়?

২.৪ বাস্তববাদের সমালোচনা ঃ

একথা অনস্বীকার্য রাজনৈতিক বাস্তববাদের আবির্ভাব ঘটেছিল এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে ক্ষমতার রাজনীতির যুপকাষ্ঠে আদর্শবাদের ধ্বংস হওয়া এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ঠান্ডা যুদ্ধের দীর্ঘ ছায়া, পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা, সামরিক নিরাপত্তা ভিত্তিক কার্য গঠনের নিরন্তর প্রচেষ্টা রাজনৈতিক বাস্তববাদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার একটি উর্বর জমি তৈরী করেছিল। কিন্তু, ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের ঠিক কিছুদিন আগে হঠাৎই কেন দুই বৃহৎশক্তি নিরস্ত্রীকরণের দিকে ঝুঁকে পড়ল, কেনই বা দুই মেরুর পৃথিবী গণতান্ত্রিক আদর্শের দিকে আকৃষ্ট হল, অর্থনৈতিক কুটনীতি সামরিক নীতির চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ল, সে বিষয়ে কোন উত্তর কিন্তু বাস্তববাদীরা দিতে পারলেন না। অর্থাৎ অন্যভাবে বলা যায়, রাজনৈতিক বাস্তববাদ তত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে ভবিষ্যদ্বানী করার ওপর গুরুত্ব দিলেও এই তত্ত্বটি কিন্তু পরিবর্তিত বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থার যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছে, একথা বলা বোধ হয় কঠিন। অন্যদিকে রাজনৈতিক বাস্তববাদ রাষ্ট্রকেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একমাত্র আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গণ্য করে এবং মনে করে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক মূলত পরিচালিত হয় ক্ষমতার রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। এটি নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির লেখচিত্র। যা এই আলোচনার মধ্যে নেই, তা হল, কিভাবে এই নৈরাজ্যভিত্তিক, সংঘাতসংকুল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা পরিবর্তিত হতে পারে সে সম্পর্কে কোন বিশদ আলোচনা। তৃতীয়তঃ, মর্গেনথাউ খুব বেশী রকম গুরুত্ব দিয়েছিলেন প্রত্যক্ষবাদী (positivist) তত্ত্ব ও আলোচনাপদ্ধতির (methodology) ওপর। প্রশ্ন হল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন সর্বজনীন সূত্র সত্যিই কি গ্রহণ করা যায়? মর্গেনথাউ-এর মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে যে তত্ত্ব, অর্থাৎ, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বীয় উপোযোগিতার চূড়ান্তকরণের (selfish, egoist and utility maximizing) উপাদান, তা কি ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? চতুর্থতঃ, মর্গেনথাউ তার তত্ত্বটিতে সামরিক নীতির ওপর যে গুরুত্ব দিয়েছেন, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নীতির ক্ষেত্রে সে গুরুত্ব দেননি বা অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিষয়ক নীতির মধ্যে

যে গভীর যোগ থাকতে পারে, তাও মর্গেনখাউ তার আলোচনায় বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেননি।

২.৫ নয়াবাস্তববাদ (Neorealism) :

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্থনীতির গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়ার ব্যর্থতা এবং পরিবর্তিত আর্থরাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র ভিন্ন অন্যান্য অরাষ্ট্রীয় সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে বাস্তববাদের তত্ত্বের মধ্যে অন্তর্গত না করতে পারার ফলে বাস্তবাদের আলোচনার ক্ষেত্রে যে সমালোচনা শুরু হয়েছিল, তার থেকে উত্তরণের জন্য সৃষ্টি হয় নয়াবাস্তববাদের (Neorealism)। ১৯৭৩ সালের তৈল সংকটকে এই তত্ত্বটির বিকাশের তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে ধরা হয়— আসলে, ১৯৭৩ সালে আরব-ইজরায়েলি যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে Organization of Petroleum Exporting Countries বা OPEC-এর তেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আগামী দিনে অর্থনৈতিক কূটনীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতেই নয়াবাস্তববাদীরা এগিয়ে আসেন। ১৯৭০-এর শেষ থেকে এই তত্ত্বটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কেনেথ ওয়ালজের (Kenneth Waltz) Theory of International Politics (১৯৭৯) বইটিতে এই তত্ত্বের মূল ধারাটি বিবৃত হয়েছে। ওয়ালজ-এর মতে প্রচলিত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রধান তত্ত্বগুলি— তা ব্যবস্থা তত্ত্বই হোক (systemic theory) অথবা মার্ক্সীয় তত্ত্বই হোক— হল প্রধানতঃ বিজারিত (reductionist)। অর্থাৎ এই তত্ত্বগুলি কয়েকটি উপাদান বা তাদের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। কিন্তু তারা কখনই আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে কাঠামো বা structure-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। নয়া বাস্তববাদী তত্ত্বটির মূল উদ্দেশ্য ছিল দুটি : প্রথমতঃ, রাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনাকে কাঠামোর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা; এবং দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক বাস্তববাদের রাজনৈতিক ও সামরিক সম্পর্কের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা করবার প্রবনতাকে অর্থনৈতিক পরম্পরার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হওয়া। ওয়ালটজের মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা যায় মূলত তিনটি উপাদানের মাধ্যমে :

(১) "the ordering principle of the system", বা ব্যবস্থার শৃঙ্খলীকরণের নীতি;

(২) "the character of the units in the system", বা ব্যবস্থার এককের চরিত্র; এবং,

(৩) "the distribution of the capabilities of the units in the sys-

tem" বা ব্যবস্থার এককসমূহের ক্ষমতার সামর্থ্যের বণ্টন।

ওয়ালজের মতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রধান গঠনমূলক নীতিটিই হচ্ছে নৈরাজ্য এবং আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রকের অনুপস্থিতি। সমস্ত রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আত্মরক্ষা করা এবং সামরিক শক্তিবৃদ্ধির মাধ্যমে স্বীয় ক্ষমতা বাড়ানো। যেহেতু সমস্ত রাষ্ট্রকেই একই ধরনের আন্তর্জাতিক পরিবেশের মুখোমুখি হতে হয়, সেহেতু সমস্ত রাষ্ট্রই — তা যতই বৈপ্লবিক রাষ্ট্রব্যবস্থা হোক না কেন— একই ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় আত্মরক্ষার জন্য। এই নিয়মটি চলে আসছে কয়েক শতাব্দী ধরে এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন বা বিবর্তনের মধ্যেও এই বহির্দেশীয় নিয়মটি অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিবেশ বিভিন্ন রাষ্ট্রকে একই ধরনের কার্যসূচী গ্রহণ করতে বাধ্য করলেও তাদের নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার এবং সামর্থ্যের বৈষম্য এতই প্রবল যে শেষ পর্যন্ত শক্তি-সাম্যের নীতিই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই কারণেই, বৈপ্লবিক আদর্শ অনুসরণ করা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নকে ওয়ারশ্ চুক্তি সম্পাদন করতে হয়েছিল। এই চুক্তির ফলেই, ওয়ালজ্ মনে করতেন, দ্বিমেরু বিশিষ্ট ব্যবস্থাই (bipolar system) ঠান্ডাযুদ্ধের সময়ে বিশ্ব শান্তি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। তার মতে, শক্তি সাম্যের নীতি একবার প্রতিষ্ঠা হলেই যে তা চিরায়ত হবে, এমন নয়, তবে কোন না কোন ভাবে, চূড়ান্ত নৈরাজ্যের মধ্যে শক্তি সাম্যের নীতি কোন না কোন ভাবে পুনরুজ্জীবিত হবে।

২.৬ নয়াবাস্তববাদের সমালোচনা ঃ

এনড্রু লিনকলেটার (Andrew Linklater) ১৯৯৫ সালে লেখা 'New realism in theory and practice' নামক প্রবন্ধে নয়াবাস্তববাদকে তিনটি দিক থেকে সমালোচনা করেছেন। প্রথমতঃ, এই তত্ত্বটি একক (unit) এবং ব্যবস্থার (system) মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক কি হবে সে সম্পর্কে পরিস্কার করে কিছু বলেনি, এবং রাষ্ট্রও যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা নিতে পারে, সে সম্পর্কে এই তত্ত্বটি নীরব। মূলত, ওয়ালজের মতে, রাষ্ট্রের প্রকৃতি যাই হোক না, তাদের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় কিছু নিয়ম মেনে চলতেই হবে। কিন্তু বাস্তব পৃথিবীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিবর্তন ঘটেছে এবং তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির পরিবর্তন এবং তার সঙ্গে বাণিজ্যিক রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলি সাম্প্রতিক কালে আর ভুখণ্ড দখলের চেষ্টা করে না— বরং অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে শান্তির ও সহযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠা করতে চায়। দ্বিতীয়তঃ, নয়া বাস্তববাদের

অন্যতম সমস্যা হল, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নীতিবোধ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, সেটিকে অস্বীকার করা। ওয়ালট্জ স্বার্থান্ধতাকে রাষ্ট্রের ও নৈরাজ্যকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ভাবে বলা যায় সার্বভৌমত্ব তৈরী হয় সামাজিক পদ্ধতির মাধ্যমে এবং এর ধারণাও পরিবর্তিত হয় যুগের প্রয়োজনে — নৈরাজ্য থাকতেই পারে, কিন্তু এই নৈরাজ্যের মধ্যেই গড়ে ওঠে সহযোগিতার ভিত্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যে তৈরী হয়েছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভিত্তি। কিউবার অস্ত্র সংকটের (Cuban Missile Crisis) মধ্যেই স্বাক্ষরিত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে Hotline Agreement (১৯৬৩)। নয়াবাস্তববাদ রাষ্ট্রের চরিত্রকে অপরিবর্তিত থাকবে বলে অনুমান করে— আর এর অবধারিত ফল হল, নৈরাজ্যের মধ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা। তৃতীয়তঃ, নয়াবাস্তববাদ ক্ষমতা ও ক্ষমতার সাম্যের ওপর এত বেশী গুরুত্ব দেয় যে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা, এই তত্ত্বের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আসলে, নয়াবাস্তববাদ সাম্প্রতিক ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে তার উপরে অত্যাধিক গুরুত্ব দেয় যার অবধারিত ফলশ্রুতি হিসেবে নয়াবাস্তববাদ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় আদর্শের ভূমিকাকে জাতীয় স্বার্থ, বা জাতীয় নিরাপত্তার চেয়ে তুলনামূলক ভাবে বেশী প্রয়োজনীয় বা আদৌ প্রয়োজনীয় কিনা, তা নিয়ে আলোচনা করতে পারে না। লিনকলেটারের মতে "No importance is attached to the practical efforts of states to create new global norms or to theoretical attempts to articulate new conception of political community and foreign policy. The emphasis is placed on the doomed utopianism of reformist projects"। অর্থাৎ, নূতন ধরনের বিশ্বায়িত আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের ব্যবহারিক প্রচেষ্টা বা নতূন ধরনের রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা পররাষ্ট্রনীতির ধারণাকে সুবিন্যস্ত করার তাত্ত্বিক প্রচেষ্টা এই তত্ত্বটিতে কোন গুরুত্ব পায়নি। পরিবর্তে, সংস্কারমুখী প্রকল্পের নিয়তি নির্দেশিত কষ্টভোগের কল্পনাপ্রবণ ভাবনাই মুখ্য হয়ে উঠেছিল। একটু অন্যভাবে বলা যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি আদর্শগত অঙ্গীকার আছে যার মাধ্যমে ক্ষমতাকেন্দ্রিকতার বাইরে সহযোগিতাভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা যায়— দুর্ভাগ্যক্রমে নয়াবাস্তববাদ এই বিকল্প ব্যবস্থার কথা মানতে একরকম নারাজ।

২.৭ বাস্তববাদ ও নয়াবাস্তববাদ সম্পর্কে কিছু বক্তব্য ঃ

বাস্তববাদ ও নয়াবাস্তববাদের আলোচনার উপসংহারে নিম্নোক্ত বক্তব্যগুলি উল্লেখ্য। প্রথমতঃ, কোন কোন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ বাস্তববাদের বিকল্প হিসেবে

"Subaltern realism" -এর কথা বলেন। মহম্মদ আইয়ুব এই বক্তব্যের একজন মূল প্রবক্তা। তার মতে, বৃহৎ শক্তির সঙ্গে তুলনায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি অনেক বেশী ক্ষমতাহীন, অথচ বিশ্বব্যবস্থায় এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই মত অনুযায়ী, এই দেশগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয় বহির্বিশ্বের গতিময়তার মাধ্যমে। আবার এই সব দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয় এই সব রাষ্ট্রের রাষ্ট্রগঠনের পদ্ধতির মাধ্যমে। ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সংঘাত ও সেই সব সংঘাতে তৃতীয় বিশ্বের ভূমিকা পর্যালোচনা করতে হবে অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাতের চরিত্র ও গতিশীলতা আলোচনার মাধ্যমে। আইয়ুব মনে করেন, নয়াবাস্তববাদ বা নয়া উদারনীতিবাদ আন্তর্জাতিক সংঘাতের পেছনে যে রাষ্ট্রগঠনের ও রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী (political community) গঠন পদ্ধতির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, তা আলোচনা করে না— subaltern realism এই দিকটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে চায়। এই তত্ত্বটি অবশ্য এর পরে খুব বেশী আলোচনা হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ, একথা অনস্বীকার্য যে মর্গেনথাউ রাষ্ট্রকেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়ের একমাত্র একক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রভাবে রাষ্ট্রের ভূমিকা যখন ক্রমশই গৌণ হয়ে আসছে তখন মর্গেনথাউ রাষ্ট্রের গুরুত্ব কি ভাবে দেখবেন? এখানে বলা যায়, স্কট বারচিল (Scott Burchill) তার একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, মর্গেনথাউ রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্রমহ্রাসমান গুরুত্বকে অস্বীকার করেননি— তিনি নিজেই বলেছেন "nuclear power, together with modern technologies of transportation and comunications, which transcends the ability of any nation-state to control and harness it and render it both innocuous and beneficial, requires a principle of political organization transcending the nation-state." অর্থাৎ, পারমানবিক অস্ত্র, পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার জাতীয় রাষ্ট্রের নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ও নিজের কাজ করবার ক্ষমতা যেমন অতিক্রম করে গেছে, তেমনি রাষ্ট্রকে একদিকে করে তুলেছে নির্দোষ এবং অন্যদিকে উপকারী প্রতিষ্ঠান। আর এই পরিস্থিতিতেই এমন এক ধরনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, যা জাতীয় রাষ্ট্রকে অতিক্রম করে যাবে। স্কট বারচিল দেখিয়েছেন মর্গানথাউ এই পরিস্থিতিতে জাতীয় রাষ্ট্রের উর্ধ্বে আন্তর্জাতিক জনগোষ্ঠী এবং বিশ্ব রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনাকেও অস্বীকার করেননি।

সর্বশেষতঃ, কেনেথ ওয়ালট্জ-এর নয়া বাস্তববাদের সমালোচনা হিসেবে বলা হয়, ওয়ালট্জ সর্বদাই ব্যবস্থা বা 'System' এবং কাঠামো বা 'Structure'-কেই Unit-বা এককের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। এখানে বলা দরকার ওয়ালটজ্ কিন্তু

Unit এবং System বা Structure-এর মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতকে অস্বীকার করেন নি— তার মতে যে ঐতিহাসিক ক্ষণে তিনি লিখেছেন, সেই সময়ে একক বা 'Unit'-এর পক্ষে 'System'-কে প্রভাবিত করা বা 'Structure'-কে অস্বীকার করা ছিল অনেকটাই অসম্ভব। ওয়ালট্‌জের মতে কাঠামোগত বাধা যে অনিতক্রম্য, একথা সব সময় সত্য নাও হতে পারে। তিনি পরবর্তীসময়ে লিখেছেন, "Virtuosos transcend the limits of their instruments and break the constraints of systems which constrain lesser performers." অর্থাৎ, শিল্পকলা বা সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণ তাঁদের যন্ত্রপাতির সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করেন এবং যে ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে দুর্বল নির্বাহকদের কাজে বাধার সৃষ্টি করে, তাকে পরিবর্তন করেন। এই উক্তির তাৎপর্য হল, একক প্রয়োজনে কাঠামো ও ব্যবস্থার সমস্যাকে প্রয়োজন অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়। আমাদের মূল বক্তব্য বাস্তববাদের একটি চিরায়ত প্রজ্ঞা ("timeless wisdom") আছে, যা অনস্বীকার্য— আবার অন্যদিকে এই তত্ত্বের প্রবক্তারা পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে যেমন অস্বীকার করেননি, তেমনি চেয়েছেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে পরিবর্তনশীল দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করতে।

২.৮ বহুত্ববাদ (Pluralism) :

সত্তরের দশকের প্রথমভাগে আরব - ইসরায়েল সংঘাত এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে তৈল সংকট একদিকে যেমন নয়াবাস্তববাদের পটভূমিকা তৈরী করেছিল, তেমনি ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগ এবং ১৯৭০-এর প্রথমভাগে বাস্তববাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুত্ববাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ কথা সত্যি যে বহুত্ববাদ নামে যে সমস্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পন্ডিতদের নাম উল্লেখ করা হয়, তারা এই বিশেষণটি খুব একটা পছন্দ করেন না — মূলত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কয়েকটি দিককেই এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা হয়। রিচার্ড রোসক্রেনস্ (Richard Rosecrance) মনে করেন নরমান এনজেল-এর (Normal Angell) ১৯১২ সালে লেখা The Great Illusion : A Study of the Relations of Military Power to National Advantage গ্রন্থটিতে প্রথম বহুত্ববাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এনজেলের মতে, অর্থনৈতিক পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সমগ্র বিশ্বকে এতটাই কাছাকাছি নিয়ে এসেছে যে বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার জন্যই এক দেশ অপর দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে না। নিঃসন্দেহে পারস্পরিক নির্ভরশীল দুনিয়াতেও যুদ্ধ দেখা দিতে পারে, কিন্তু এনজেল-এর মতে যুদ্ধের ফলে কোন রাষ্ট্রই উপকৃত হবে না। রিচার্ড লিটলের (Richard Little) মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গোষ্ঠী তত্ত্বের উদ্ভবের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বহুত্ববাদী তত্ত্বের বিকাশের একটি সম্পর্ক আছে।